ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2008

ARTICLES

A Legal Study on Fatwa regarding Hilla Marriage in Bangladesh

Transnational State Responsibility for Violations of Human Rights

The Economic and Social Council and the Specialized Agencies

The Role of NGO'S in Protection and Promotion of Human Rights of Women in Bangladesh

Blasphemy and Criminality: An Islamic Perspective; Special Reference to Bangladesh

Sexual Harassment in Bangladesh: Law and Realities

Land Management in Islam: A Legal Study

The Role of Selected Non-Governmental Organizations (NGOs) in the Protection and Promotion of Human Rights: An Analysis

State of Minimum Wages in Bangladesh –Problems and Perspectives

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত জটিলতা: শিশু-কিশোর প্রসঙ্গ

নারীদের উপর এসিড-নিক্ষেপ: গণমাধ্যমের ভূমিকা ও আইন

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 05 2008

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

Faculty of Law
University of Rajshahi

Rajshahi University Law Journal 2008

Editorial Board

Editor **Dr. Begum Asma Siddiqua**
Professor, Department of Law & Justice
and
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Dr. M. Habibur Rahman**
Professor, Department of Law & Justice, RU

Dr. Muhammad Faiz-Ud-Din
Professor, Department of Law & Justice, RU

Mr. Abu Naser Md Wahid
Associate Professor, Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Associate Professor, Department of Law & Justice, RU

Mrs. Sayeeda Anju
Assistant Professor, Department of Law & Justice, RU

Mr. Md. Sahal Uddin
Lecturer, Department of Law & Justice, RU

Rajshahi University Law Journal
Faculty of Law
University of Rajshahi

Volume 05 2008

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by

Md. Ariful Islam
Text Dot Com (TDC)
Farmgate, Motihar, Rajshahi-6212
Mobile: 01711-951377

Printed at

Padma Offset Printers
Malopara, Rajshahi. Phone : 775356

Subscription Rates

For Individuals : TK 100.00 US$ 20 (without postage)
For Organisation : TK 150.00 US$ 30 (without postage)

[Published in September 2009]

Rajshahi University Law Journal 2008

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	A Legal Study on *Fatwa* regarding *Hilla* Marriage in Bangladesh	01-14
Dr. M Abdul Hannan	Transnational State Responsibility for Violations of Human Rights	15-54
M. Ehteshamul Bari	The Economic and Social Council and the Specialized Agencies	55-70
Md. Abdul Alim	The Role of NGO'S in Protection and Promotion of Human Rights of Women in Bangladesh	71-84
Md. Abdul Awal Khan	Blasphemy and Criminality: An Islamic perspective; Special Reference to Bangladesh	85-98
Md. Abdur Rahim Mia	Sexual Harassment in Bangladesh: Law and Realities	99-118
Mohammad Azharul Islam	Land Management in Islam: A Legal Study	119-138
Dr. Muhammad Faiz-ud-Din	The Role of selected Non-Governmental Organizations (NGOs) in the Protection and Promotion of Human Rights: An Analysis	139-166
Muhammad Shaheen Chowdhury	State of Minimum Wages in Bangladesh – Problems and Perspectives	167-194
নাহিদ ফেরদৌসী	বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত জটিলতা: শিশু-কিশোর প্রসঙ্গ	195-210
মুসতাক আহমেদ ও মো. সাহাল উদ্দীন	নারীদের উপর এসিড-নিক্ষেপ: গণমাধ্যমের ভূমিকা ও আইন	211-230

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত জটিলতা: শিশু-কিশোর প্রসঙ্গ

নাহিদ ফেরদৌসী*

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে বিরাজ করছে বহুবিধ সামাজিক সমস্যা। এর মধ্যে শিশু ও কিশোর অপরাধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশে মোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি যা সমগ্র জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ।[১] শিশু-কিশোররা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদের বেড়ে ওঠার সময়ের প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বড়দের জীবন থেকে আলাদা। তারা অনেক সময় পরিবারে মত প্রকাশ করতে পারে না। আবার খুব সহজেই পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণেও বিপদগামী হয়ে যায় অনেক শিশু-কিশোর। এভাবে নানা কারণে তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে অপরাধ করে।[২] নিজের ও অন্যের ঘরের মালামাল চুরি, পকেটমার, মাদকাসক্ত, জুয়া খেলা, ছিনতাই, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ইত্যাদি অপরাধে তারা অভিযুক্ত হয়। এছাড়া বিভিন্ন আইনের আওতায় তারা অনেকসময় অপরাধ করছে এবং আটক হচ্ছে। এভাবে শিশু-কিশোররা যখন কোন অপরাধে জড়িত হয় তখন তাদেরকে ভিন্ন মানদণ্ডে, বিশেষ নীতি বা আদর্শের আলোকে বিষয়টি দেখা প্রয়োজন, যাতে তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।[৩] উল্লিখিত চিন্তা চেতনার আলোকে অপরাধে জড়িত শিশু-কিশোরদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, সংশোধন, সামাজিকভাবে উন্নয়ন এবং অন্যান্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে "শিশু আইন" প্রবর্তন করা হয়। অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের বিচার, সংশোধন, শাস্তি, নিরাপত্তা এবং হেফাজতের জন্য পূর্বের সকল আইন সমন্বিত ও সংশোধন করে 'শিশু আইন, ১৯৭৪' প্রণীত হয়। এ আইন শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থার মূখ্য আইন। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার আওতায় বিচার করে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে সামাজিকভাবে উন্নয়নের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং শিশু আদালতের বিষয়সমূহ এ আইনে আলোচিত হয়েছে।[৪]

এ প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে শিশু-কিশোররা কখন ও কিভাবে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং এদের আইন ও বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত জটিলতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অভ ল', বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১ *Population Census 2001*, (Provisional) (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2003), pp. 322-711.

২ মোঃ নুরুল ইসলাম ভূইয়া প্রমুখ, সম্পা, *বাংলাদেশে কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম*, (ঢাকা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০০২), পৃ. ২।

৩ শাহদীন মালিক, *শিশু আইন, ১৯৭৪ একটি পর্যালোচনা*, (ঢাকা: সেভ দি চিলড্রেন, ইউকে, ২০০৫), পৃ. ২।

৪ তদেব, পৃ. ২।

শিশু-কিশোর: সংজ্ঞা

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর সংজ্ঞায় বিভিন্ন বয়সসীমা বর্ণিত আছে। শিশুদের নানা ধরণের প্রয়োজন মেটানো বা সুরক্ষার লক্ষ্যে নির্দেশনা দিয়েছে প্রায় ৩২টি আইন।[৫] এরমধ্যে শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী যার বয়স ১৬ বছরের নীচে সে শিশু হিসেবে গণ্য।[৬] অন্যান্য আইনের মধ্যে ১৮৭৫ সালের সাবালকত্ব আইনে ও ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের মানুষকে শিশু বলে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ২ ধারায় শিশু অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেনি এমন কোন ব্যক্তি এবং কিশোর অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেছে কিন্তু ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেনি এমন কোন ব্যক্তি। আবার জাতীয় শিশু নীতিমালা অনুযায়ী শিশুর বয়স সর্ব্বোচ ১৪ বছর ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে বিশেষতঃ ১৯৮৯ সালের জাতিসংঘ শিশু সনদে যে ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের নীচে সে ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য। তবে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন শিশুর সংজ্ঞা হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রচলিত অন্য কোন আইনকে উদ্ধৃত নাই এবং ১৬ বছরের নীচের ব্যক্তিকে শিশু বলেছে। তাই ১৬ বছর বয়সের কোন শিশু-কিশোর যদি দেশের বিদ্যমান আইন লংঘন করে কোন প্রকার অপরাধমূলক কাজ করে বা সে ধরণের কোন কাজে জড়িত হয়ে অভিযুক্ত হয় তবে সে শিশু বা কিশোর অপরাধী (Juvenile Offender) বলে গন্য হয়।[৭]

আইনের সংস্পর্শে জড়িত শিশু-কিশোর

যখন শিশু-কিশোররা কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয় তখন তারা আইনের সংস্পর্শে আসে। যেমন: কোন শিশু বা কিশোর নিজের ঘরের টাকা বা মালামাল চুরি করে বা অন্যের জিনিস চুরি করে, বাড়ি থেকে কোথাও না বলে চলে যায়, স্কুল ফাঁকি দেয়, সিগারেট বা যে কোন নেশা করে, মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে ও কেনাবেচা করে, ছিনতাই করে, মেয়েদের উত্যক্ত করে, রাস্তায় পিকেটিং করে ইত্যাদি কাজে জড়িত হলে তাকে শিশু বা কিশোর অপরাধী বলা হবে। অনেক সময় শিশু-কিশোররা অপরাধী হয়ে আইনের সংস্পর্শে আসা ছাড়াও সাক্ষী বা ভিকটিম হয়ে অর্থাৎ অপরাধ না করে অপরাধের শিকার হয়ে আইনের সংস্পর্শে আসে। যেমন: পাচার হওয়ার সময় বা পাচার হয়ে, অজ্ঞতা বশত মাদক দ্রব্য বা অস্ত্র বহন করতে গিয়ে আইনের সংস্পর্শে আসে ইত্যাদি।[৮] আবার সেই সকল শিশু-কিশোর যাদের বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। যেমন: পথশিশু বা উদ্বাস্তু শিশু এবং অভিভাবক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শিশু, এরা অন্যের দেখাদেখি বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি সন্ত্রাসী বা চাঁদা, হত্যাকান্ডে ইত্যাদি ঘটনায় তাদের জড়িত হতে দেখা যায়।

---

৫ The Majority Act 1875, The Contract Act 1872, The Guardians and Wards Act 1890, The Orphanages and Widows Homes Act 1944, The Criminal Procedure Code 1890, The Juvenile Smoking Act 1919, The Child Marriage Restraint Act 1929, The Children Act 1974, National Children Policy (NCP) 1994, *The Women and Children Oppression (Suppression) Act, 2000.*

৬ শিশু আইন ১৯৭৪, ধারা ২(ক)

৭ শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি*, (খুলনা: চৌধুরী পাবলিকেশন্স, ২০০৭), পৃ. ১০।

৮ প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫।

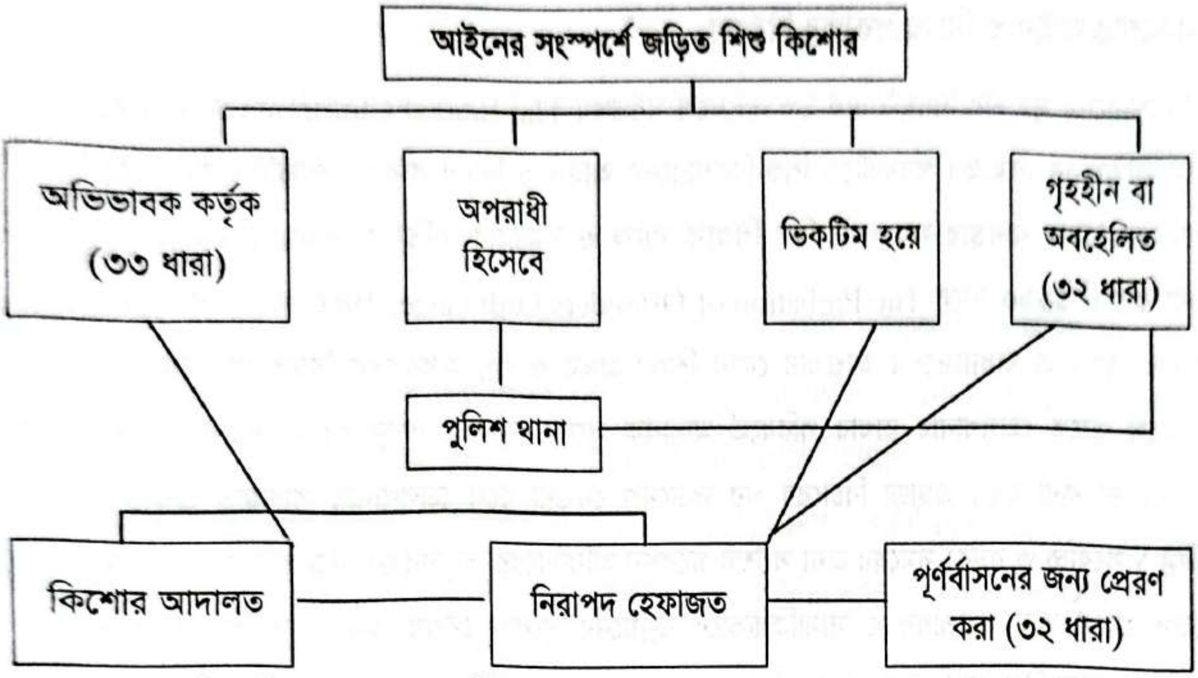

বাংলাদেশে শিশু-কিশোর অপরাধ চিত্র

বাংলাদেশে শিশু-কিশোর অপরাধীদের সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতি পরিচালিত কিশোর অপরাধী কল্যাণকল্পে সহায়ক ব্যবস্থা প্রকল্পের তথ্যানুযায়ী শুধুমাত্র ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ২০০০ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ও সংখ্যা নিম্নরূপ-

অপরাধের প্রকৃতি	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
পকেটমার/চুরি	১০৫	১৩৮	১২৩	১১২	১৩০	১২১	১১৩
ডাকাতি	১২	১৪	১৮	১৭	১৯	১২	২০
অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য	৫৩	৪২	৫৫	৬৯	৫৬	৫২	৭১
সন্ত্রাস ও দাঙ্গা	৩০	৩২	৩০	২৭	২৪	২১	৩০
নারী নির্যাতন	২০	১৮	১৪	১৯	১০	১৫	২২
খুন	১০	১৪	১৫	২২	১৯	১৪	১৫
মাদকদ্রব্য	১৪	১৮	২২	২৯	৩৬	২৬	৩৭
নিরাপদ হেফাজত	২৮	৩৮	২১	৩৩	২৮	৩৭	২২
সন্দেহমূলক	১১৯	১২৮	১৪০	৯২	১০৪	১১৮	১২১
ভবঘুরে	৪০	৫০	৪১	১৭	২৬	৩০	৩৫
অন্যান্য	২৬	২০	৫৭	৬৮	৬৪	৭৫	৪২
প্রতি বছর মোট অপরাধ	৪৫৭	৫১২	৫৩৬	৫০৫	৫১৬	৫২১	৫২৮

উৎস: বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কিশোর অপরাধী কল্যাণকল্পে সহায়ক ব্যবস্থা প্রকল্প থেকে সংগৃহীত, ২০০৭।

শিশু-কিশোর আইন ও বিচার পদ্ধতির বির্বতন

শিশু-কিশোরদের সুরক্ষার বিষয়টি এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম The Bengal Children's Act, 1922 এর মাধ্যমে প্রতিফলন হয়েছে। পরবর্তীতে শিশু-কিশোরদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিশু-কিশোরদের বিচার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল শিশুকে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে সুরক্ষা ও পরিচর্যা করা।[৯] ১৯৬০ সালে The Probation of Offenders Ordinance, 1960 নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশের আওতায় কোন শিশুর প্রথম ও লঘু অপরাধের বিচার পরিচালনা ও রায় প্রদানকালে তাকে জেলখানায় রাখার পরিবর্তে মানবিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিচারের পর দণ্ডাদেশ দেওয়া হলে জেলখানার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট (সর্বনিম্ন ১ সর্বোচ্চ ৩ বছর) সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিজ পরিবারে বা সামাজিক পরিবেশে রেখে তার সংশোধন ও সামাজিকভাবে উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হয়।[১০] অবশ্য প্রথম ও লঘু অপরাধে সংবেদনশীল প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদেরও প্রবেশনে রাখার বিধান এ আইনে আছে। তবে শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রবেশন ব্যবস্থার বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রবেশন অর্ডিন্যান্সের পর ১৯৭৪ সালে দেশে 'শিশু আইন ১৯৭৪' প্রণীত হয় যেখানে এ প্রবেশন ব্যবস্থা কার্যকরী করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[১১] The Reformatory School Act, 1987, The Bengal Children's Act, 1922, The Probation of Offenders Ordinance, 1960 ইত্যাদি আইনের ধারাবাহিকতায় শিশু আইন ১৯৭৪-এর বিকাশ ঘটে। এ শিশু আইনের দ্বারা পূর্ববতী The Bengal Children's Act, 1922 এবং The Reformatory School Act, 1987, রহিত হয়েছে।[১২] পরবর্তীতে শিশু আইনের আওতায় ১৯৭৬ সালে শিশু বিধিমালা প্রণীত হয়।[১৩] এছাড়া ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক দলিল ও নীতিমালায় দিকনির্দেশনা রয়েছে যে শিশু-কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রীক বা শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মূল লক্ষ্য শিশুকে

---

৯ Shahdeen Malik, *The Children Act, 1974: A Critical Commentary*, (Dhaka: Save the Children UK, 2004), pp. 21-36.

10 Borhan Uddin Khan and Muhammad Mahbubur Rahman, *Protection of Children in Conflict with the Law in Bangladesh*, (Dhaka: Save the Children, UK, 2008), p.15

১১ মো: নুরুল ইসলাম ভূইয়া প্রমুখ, সম্পা, *বাংলাদেশে কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম*, (ঢাকা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০০২), পৃ. ১২।

১২ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, (ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২০০৬), পৃ. ৭।

১৩ শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি*, পৃ. ৯।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।[১৪] বাংলাদেশের শিশু আইন, ১৯৭৪-এর মূলনীতিও যে কোন ধরণের অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর জন্য শাস্তি নয় বরং সুরক্ষা ও সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা[১৫]।

শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থা

শিশু-কিশোরদের সুরক্ষার জন্য আইন

শিশু আইন, ১৯৭৪ শিশু-কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ বিষয়ক একটি ব্যাপকভিত্তিক আইন যার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য একবার অপরাধের জন্য শিশুটি যেন চিরদিনের জন্য অপরাধী হিসেবে পরিগণিত না হয়।[১৬] এ আইনে অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে শাস্তি ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী ১৬ বছরের নিচের বয়সী শিশু দ্বারা যে কোন অপরাধ কিশোর অপরাধ ও এ ধরণের অপরাধকাজে জড়িত শিশুদের 'কিশোর অপরাধী' (Juvenile Offender) বলে এবং এরা শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ পায়।[১৭]

শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থা সেসব প্রণীত আইন, নিয়ম-কানুন, মানদণ্ড, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত যা বিশেষত ফৌজদারী আইন বা দণ্ডবিধি ভঙ্গ করেছে এমন শিশু-কিশোরদের জন্য প্রযোজ্য। শিশুরা দণ্ডবিধি লঙ্ঘন বা অন্যকোন আইনের অন্তর্গত অপরাধে অভিযুক্ত হঁতে পারে যেমন: শিশু আইন ১৯৭৪, অস্ত্র আইন ১৮৭৮, বিস্ফোরক পদার্থ আইন ১৯০৮, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, বা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

এ আইন মোতাবেক অপরাধী কিশোরদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, ১৯৯৫ সালে যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ২০০৩ সালে গাজীপুর কোনাবাড়ীতে কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশু অপরাধীদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এবং অবাধ্য শিশুদের পরিচর্যা

---

১৪ The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); the UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (JDLs); The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) and the UN Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System (Vienna Guidelines)

১৫ শিশু আইন, ১৯৭৪ ধারা ৫১, ৫২, ৫৩।

১৬ Shahdeen Malik, *The Children Act, 1974 : A Critical Commentary*, (Dhaka: Save the Children UK, 2004), p. 21.

১৭ A Seminar paper on Protection of Child Rights and Safeguard and Juvenile Delinquents, Organized by Bangladesh Retired Police Officers Welfare Association and World Vision, Phulpur ADP, Mymensingh, 28 May 2007, p. 3.

হেফাজত ও পুনর্বাসনে এসব জাতীয় সংশোধনী ইনস্টিটিউট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।[১৮] আইনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সংশোধন ও প্রশিক্ষণ এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়।[১৯] সাধারণতঃ এ সকল প্রতিষ্ঠানে তিন ধরণের শিশুদের রাখা হয়। যথা-

- সন্দেহভাজন শিশু ;
- বিচারোত্তর শিশু ;
- পিতামাতা বা অভিভাবক কর্তৃক প্রেরিত নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত শিশু।

এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সংরক্ষণ এবং শিশু বান্ধব বিচার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান তিনটি বিভিন্ন কর্মসূচী আছে। যথা- (১) কিশোর আদালত (২) কিশোর হাজতবাস (৩) সংশোধনী প্রতিষ্ঠান।

(১) কিশোর আদালত

কিশোর আদালত বলতে কিশোর হাজত (রিম্যান্ড হোম) এবং সংশোধনী প্রতিষ্ঠান বোঝায়। কিশোর আদালতের প্রধান কর্তব্য হল শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ৩ ধারা মোতাবেক একজন প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারী সমন্বয়ে উক্ত আদালত গঠিত। সপ্তাহে সাধারণত দু'দিন উক্ত আদালত বসে। বর্তমানে টঙ্গী, যশোর এবং গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে ১টি করে মোট তিনটি কিশোর আদালত রয়েছে ।

কিশোর আদালত সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে এবং যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে সাধারণ আদালত শিশুদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করবেন। তবে অভিযোগ যদি এমন প্রকৃতির হয় যে, দায়রা আদালত ছাড়া অন্য আদালতে সেই অভিযোগের বিচার হতে পারে না তবে সেই অভিযোগ সম্বলিত নথিপত্র দায়রা আদালতে পাঠাতে হবে। তবে আদালত কর্তৃক আদেশ দানের পূর্বে অবশ্যই শিশুর বয়স, চরিত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হয়।[২০] কিশোর আদালতে আনা হতে পারে এমন চার শ্রেণীর শিশুদের এবং তাদের বিচারের অবকাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে।[২১]

---

১৮ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *শিশু আইন ও অধিকার*, পৃ. ৬৫।

১৯ শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি*, পৃ. ৯।

২০ *বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে কিশোরদের অবস্থার অংশীদারীত্বমূলক পর্যালোচনা*, (ঢাকা: সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং সেভ দা চিলড্রেন ইউকে, ২০০৫), পৃ. ২।

২১ মোঃ আনছার আলী খান, *শিশু বিষয়ক আইন*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ২০০৫), পৃ. ৩।

এ শ্রেণীগুলো হল-

- দুঃস্থ ও অবহেলিত শিশু-কিশোর,
- কোন অপরাধে অভিযুক্ত শিশু-কিশোর,
- অভিভাবক বা পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শিশু-কিশোর,
- অপরাধের শিকার শিশু-কিশোর। [২২]

কিশোর আদালতের এজলাসে শিশুর পিতা-মাতা এবং অভিভাবক ছাড়া সাধারণ অন্য কাউকে থাকতে দেয়া হয় না। এমনকি আদালত মনে করলে তাদেরও এজলাসের বাইরে যেতে নির্দেশ দিতে পারে। তবে অপরাধে অভিযুক্ত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে আদালত বা পুলিশ বিচারের সময় উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিতে পারেন।

কিশোর আদালতে মামলার ধরন

দেশে প্রচলিত ৩টি কিশোর আদালতে (যশোর, টঙ্গি ও কোঁনাবাড়ি) দু'ধরণের মামলা দায়ের হয়। তবে উভয় প্রকার মামলায় একমাত্র ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলে বা মেয়েদের বিচার কিশোর আদালতে করা হয়ে থাকে। যথা-

১) অভিভাবক কর্তৃক দায়ের করা মামলা

শিশু আইনের ৩৩ ধারা মতে শিশুর পিতা-মাতা বা আইনানুগ অভিভাবক তার অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন শিশুর বিরুদ্ধে কিশোর আদালতে মামলা করতে পারে। অভিভাবক কর্তৃক দায়ের করা শিশুর বিরুদ্ধে এসব মামলাকে অভিভাবক কেস বা সি.আর মামলা বলে।[২৩]

২) পুলিশ কর্তৃক দায়ের করা মামলা

প্রচলিত বিদ্যমান আইনে যে সমস্ত শিশু কোন অপরাধ করে সেকল শিশুর বিরুদ্ধে (শিশু আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারা ব্যতীত) পুলিশ বা রাষ্ট্র মামলা দায়ের করতে পারে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে থানায় মামলা হলে এসব মামলাগুলো কিশোর আদালতে স্থানান্তরিত হতে পারে।

---

২২ *কিশোর বিচার ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসা শিশু*, বিচারকগণের জন্য বেঞ্চবুক, Canadian Internation Development Agency . (Dhaka: Unicef, 2005), p. 22-23.

২৩ শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি*, পৃ. ১৬।

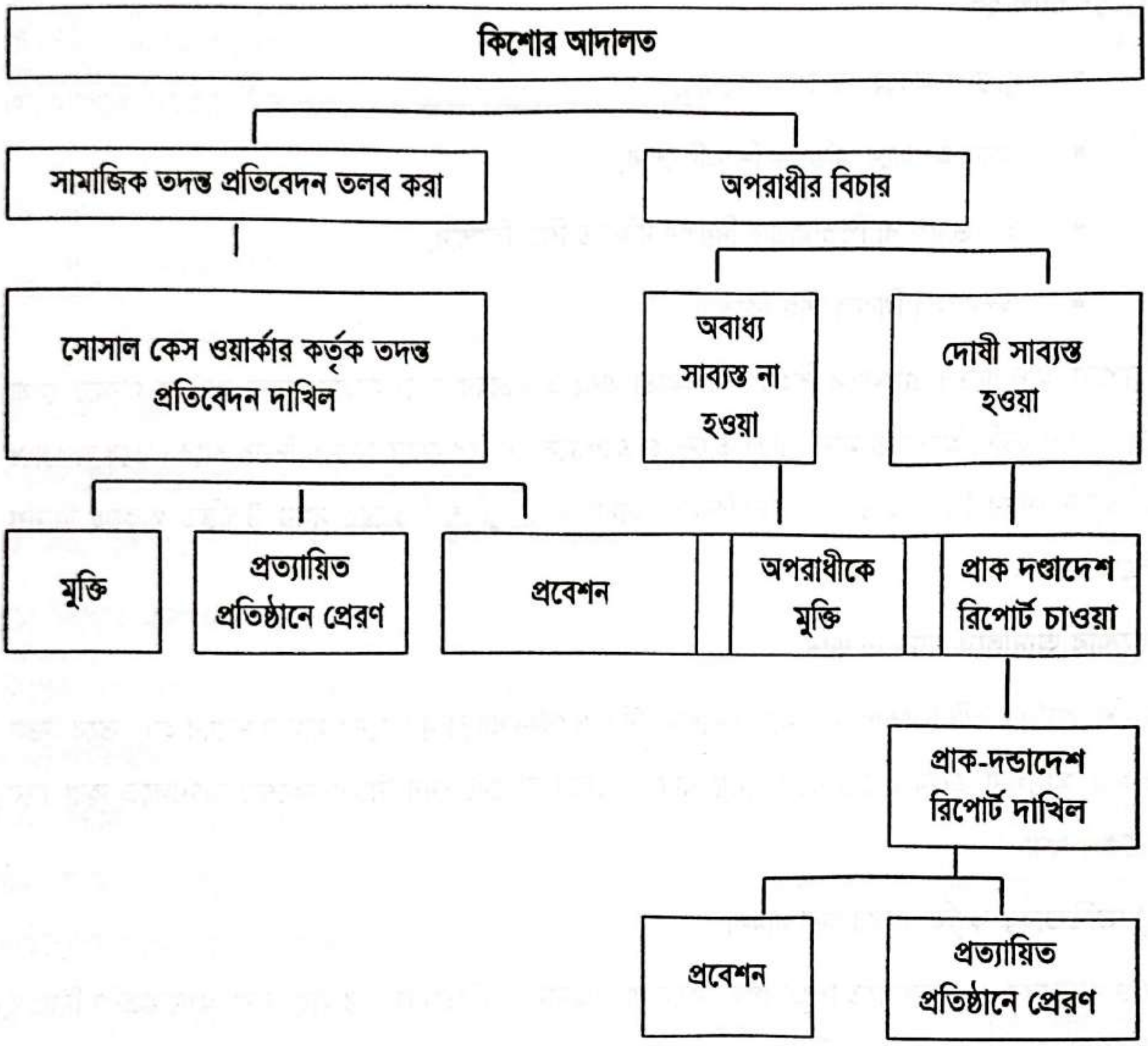

(২) কিশোর হাজতবাস (রিম্যান্ড হোম)

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিজস্ব আদালতের মতো কিশোর হাজত (রিম্যান্ড হোম) বাস আছে। আদালতে মামলাটি ওঠার পর এবং মামলা নিস্পত্তি হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কোন কোন শিশু কিশোরদের এ হাজতবাসে রাখা হয়। তবে এ সময়ে তারা পড়াশুনা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। যেহেতু হাজত বাস স্বল্পকালীন হয়ে থাকে সেহেতু তাদের পড়াশুনা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের তেমন ক্ষতি হয় না।

(৩) সংশোধনী প্রতিষ্ঠান

এসব প্রতিষ্ঠানে মূলত শিশু-কিশোাদের সংশোধন প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমোদিত ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী এবং অনুমোদিত ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত জাতীয় পাঠ্যসূচী কার্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হয়। শরীরচর্চা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। কারিগরী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অটোমোবাইল, রেডিও, টেলিভিশন মেরামত, দর্জি, কাঠমিস্ত্রী ও বৈদ্যুতিক কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত জটিলতা

আইনের একটি দিক শাসন আর অন্যটি প্রতিপালন। স্বাভাবিকভাবে শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে আইনের শাসনের চেয়ে প্রতিপালনের দিকটা বেশি জোর দেওয়া হয়।[২৪] কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শিশু আইন দ্বারা শিশু-কিশোরদের বিচার না করে অপরাধের সাথে সম্পর্কিত শিশু-কিশোরকে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার আওতায় বিচার করে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। শিশুদের কারাগারে আটক রাখা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে পাশ হয়েছে। এ আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কিছু বিষয়ে আইনের অস্পষ্টতা ও প্রায়োগিক জটিলতা সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায়। সেধরণের কিছু পদ্ধতিগত জটিলতা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

১। শিশু -কিশোরদের একক বিচার ব্যবস্থার অভাব

কোন একক শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থা নেই আমাদের দেশে। এছাড়া বাংলাদেশে শিশু অধিকার এবং এ সংক্রান্ত আইনগুলো বাংলাদেশ সংবিধান, দণ্ডবিধি, শিশু আইনসহ বিভিন্ন আইন ও সংবিধিতে লিপিবদ্ধ আছে। এ সংক্রান্ত সকল আইন একটি সংবিধিতে অন্তর্ভূক্ত নয়। কোন একক বোধগম্য কিশোর বিচার ব্যবস্থার অভাবের কারণে বিচারে যেমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে তেমন শিশুদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

২। শিশু সংক্রান্ত আইনসমূহ বাস্তবায়নের অভাব

বাংলাদেশে উপযুক্ত আইন থাকলেও মূল সমস্যা হল সেগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন হয় না। শিশুদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইনটি হল শিশু আইন, ১৯৭৪। অথচ ১৯৯০ সালের পূর্বে এই আইনটির উল্লেখযোগ্য কোন প্রয়োগ দেখা যায় না।

৩। শিশুর বয়স নির্ধারণে আইনগত জটিলতা

বিচার শুরু করার আগে যে ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করা হয়েছে সে শিশু না প্রাপ্ত বয়স্ক সে বিষয়টি নিরূপনের দায়িত্ব হচ্ছে আদালতের। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশুর জন্ম তারিখের রেকর্ড না থাকায় অনেক মামলাতে বয়স নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং আদালত তখন তাদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য কারাগারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুটির প্রথমেই পুলিশ বা আদালত বয়স নির্ধারণ করে, এক্ষেত্রে পরবর্তী কার্যক্রমে কেইস ওয়ার্কার অথবা মেডিক্যাল অফিসারের তেমন কোন ভূমিকা থাকে না।

এছাড়া শিশু আইনে শিশুকে দু'ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত: এ আইনের ২ (চ) ধারায় 'শিশু' অর্থ ১৬ বছর বা ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত: এ আইনের ৫১ ও ৫২ ধারায় শিশুকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস বা আদালত কর্তৃক কোন আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির

---

[২৪] *শেফিনা বেগম, শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি, পৃ. ৯।*

হেফাজতে আটক রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ১৬ বছরের বেশী বয়সের ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এভাবে এ আইনে শিশুর সংজ্ঞায় দু'ধরণের বয়সের কথা উল্লেখ রয়েছে।[২৫] দু'ধরণের বয়সের উল্লেখ থাকায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে এবং আইনটি সহজভাবে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য ঢাকার ২২টি থানার ৮টিতে শিশু হাজতখানার ব্যবস্থা থাকলেও শিশু অপরাধের ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণের জটিলতায় পুলিশ অনেক শিশু-কিশোরকে দাগী আসামীদের সঙ্গে রাখছে। বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়স সংক্রান্ত অসামঞ্জস্যতার ফলে গ্রেপ্তার করার পর বা ফরোয়ার্ডিং লেটারে পুলিশ শিশু অপরাধীর বয়স বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে শিশুরা সুষ্ঠু বিচার পাচ্ছে না।

৪। কিশোর আদালতের বিচারিক সীমাবদ্ধতা

শিশু আইনের ৫ ধারায় কিশোর আদালতের বিচারিক ক্ষমতা ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ ধারায় বর্ণনা আছে যে কোন স্থানীয় এলাকার জন্য কিশোর আদালত গঠন করা হলে এরূপ আদালত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোন শিশুর সকল মামলার বিচার করবে এবং এ আইনের অধীনে অন্যান্য সকল কার্যধারার কাজকর্মও নিষ্পত্তি করবে। কিন্তু এ আইনের ষষ্ঠ ভাগে উল্লেখিত কোন অপরাধের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় জড়িত কোন প্রাপ্ত বয়স্কের মামলার বিচার ক্ষমতা এ আদালতের থাকবে না। মূলতঃ কিশোর আদালতের দু'টি দায়িত্ব রয়েছে।

ক) কোন শিশু যদি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করা; এবং

খ) এই আইনের ৬ষ্ঠ ভাগে বর্ণিত অন্যান্য ধারার বিষয়সমূহের নিষ্পত্তি করা।

কিন্তু বর্তমানে টঙ্গী, যশোর এবং গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে ১টি করে মোট ৩টি শিশু আদালত রয়েছে। এটি সমগ্র দেশের জন্য নিঃসন্দেহে অপ্রতুল। গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত শিশু-কিশোরদের বিচার এ আদালত আমলে নিতে পারে না [শিশু আইন ধারা ৫(৩)]। যেহেতু কিশোর আদালতের এলাকাভিত্তিক এখতিয়ার জেলার মধ্যে সীমিত তাই ভৌগলিক বন্টন অনুযায়ী তিনটি বিভাগের জন্য একটি মাত্র আদালত রয়েছে। এতে প্রতিনিয়ত শিশুকে আদালতে উপস্থাপন, অভিভাবক থেকে বিচ্ছিন্ন করাসহ নানা ধরণের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। অবাধ্য শিশুর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তিনটি জেলার অভিভাবকগণ কিশোর আদালতের সুবিধা পায়। এই আদালত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় অনুযায়ী দুস্থঃ, নির্যাতনের শিকার ও বিপদগ্রস্থ শিশু-কিশোর বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেয় না। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক অপেক্ষমান শিশু-কিশোরদের সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহন ও প্রেরন প্রক্রিয়া খুব বেশি দীর্ঘ, ফলে শিশুরা উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের আওতাভূক্ত হয় না।

---

[২৫] *Juvenile Justice in South Asia: Improving Protecction for Children in Conflict with the Law*, (Dhaka: UNICEF, 2006), p. 39.

এছাড়া শিশু আইনের ৫ (৩) ধারায় কোন শিশু আদালত অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত দায়রা আদালতের অধঃস্তন এরূপ কোন আদালতের নিকট যখন প্রতীয়মান হয় যে, যে অপরাধে কোন শিশু অভিযুক্ত হয়েছে তা কেবল দায়রা আদালতেই বিচারযোগ্য, তখন উক্ত মামলাটি অবিলম্বে দায়রা আদালতে, এ আইনে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য বদলী করবে। কিন্তু ৩ ধারায় বর্ণিত আদালতসমূহ অপরাধী শিশুর যে কোন ধরণের বিচার করার জন্য সমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ এ আইনের ৫ এবং ৩ ধারা দুটি পরস্পবিরোধী। যেহেতু কিশোর আদালত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার বাইরে শিশুদের জন্য একটি বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা সেহেতু ফৌজদারী আইন অনুযায়ী এ আইনের এখতিয়ার নির্ধারিত থাকা উচিত নয়।

৫। শিশু-কিশোরদের জামিনে মুক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের প্রবণতা

অপরাধে জড়িত শিশু-কিশোরদের প্রায় সব সমস্যাই যত্ন ও সুরক্ষার অভাবসহ প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর মাধ্যমে সমাধান করা হয়। যেমন- যে শিশু-কিশোররা আইন ভঙ্গ করে তাদের জেল বা সংশোধনী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শিশুদের পিতামাতার দরখাস্ত মোতাবেক কিশোর আদালতের মাধ্যমে সংশোধনী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কিছু শিশু-কিশোরকে সংশোধনী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে না পাঠিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়। অথচ শিশুরা জেলে থেকে ভাল হওয়ার চেয়ে পেশাদার অপরাধীদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে তারা বড় অপরাধী হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মানসিক বিকাশও প্রতিহত হতে পারে।

৬। অপরাধের দায়বহনের বয়সের ভিন্নতা এবং শিশু-কিশোরদের বিশেষ সুরক্ষার অভাব

আমাদের দেশে জন্ম নিবন্ধন অত্যন্ত সীমিত। এছাড়ও শিশুর বয়স নির্ধারণে বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন বয়স উল্লেখ থাকায় শিশুর বয়স নির্ধারণে এবং অপরাধের দায়ভার বহনের বয়স নির্ধারণে পুলিশ অফিসারদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে প্রায় অনেক মামলায় নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী এড়িয়ে চলার জন্য শিশুটির বয়স বাড়িয়ে দেওয়ার নজীর দেখা যায়। এভাবে আইনের সুস্পষ্ট বিধানের অভাবে শিশু হিসাবে একটি শিশুর যা প্রাপ্য ছিল তা থেকে সে বঞ্চিত হয়।[২৬] যদিও ২০০৪ সালে দন্ডবিধি আইন, ১৮৬০ সংশোধন করে অপরাধের দায়-দায়িত্বের বয়স সীমা ৭ থেকে ৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা ব্যবহার হচ্ছে না।

৭। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব

স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে অপর্যাপ্ত সমন্বয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল প্রবেশন অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসারকে কারাগারে আটক শিশু-কিশোর ও কিশোরীদের তালিকা সমাজসেবা অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া আছে। কিন্তু বর্তমানে ৬৪টি জেলার মধ্যে মাত্র ২২টি জেলাতে ২৩ জন প্রবেশন অফিসার আছে। বাকী ৪২টি জেলার মধ্যে ২১টি জেলায় প্রবেশন অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এখনও তা অনুমোদন হয়নি। উক্ত ৪২ জেলায় উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা অতিরিক্ত

---

২৬ "কিশোর বিচার ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসা শিশু" বিচারকগণের জন্য বেঞ্চবুক, Unicef ২০০৫, পৃ. ২১-৩০।

দায়িত্ব হিসাবে প্রবেশন অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। অন্যদিকে ৪৮২টি উপজেলার সমাজসেবা অফিসার নিয়োজিত আছে যারা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।[২৭]

কিন্তু সমস্যা হল স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত টাস্ক কোর্সের যথাযথ সহায়তার অভাব এবং কারাগারে আটক শিশু-কিশোরদের সেফহোম অথবা উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তরে বিলম্ব বা অনীহা। তাছাড়া আদালতের নিজস্ব পরিবহনেরও অভাব আছে। এছাড়া শিশু গ্রেফতার হলে, তদন্তকালীন, বিচারাধীনকালে, আটকাবস্থায়, রায় প্রাপ্তিতে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। কিশোর বিচার ব্যবস্থায় সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোর সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রাখা প্রয়োজন । ভবিষ্যতে অপরাধ বাড়ছে না কমছে তা হিসাব করে পরবর্তী বিকল্প কর্মসূচী নেওয়া সহজ হবে।

৮। শিশু-কিশোর অপরাধীর বিচার্য বিষয় অবহেলা ও ফৌজদারী ব্যবস্থা অনুসরণ

শিশু আইনে শিশু অপরাধীর বিচার্য বিষয় অবহেলা ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ হয়।

শিশু আইনের ১৫ ধারায় বর্ণিত আছে আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে: (ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স; (খ) শিশুর জীবন ধারণের পরিবেশ; (গ) প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট এবং (ঘ) শিশুটির স্বার্থে যে সকল বিষয় বিবেচনা করবে বলে আদালত মনে করে সে সকল বিষয়।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুটি কোন অপরাধ করেছে, সে ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে এ মর্মে আদালত তদন্তের রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করার পর উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে। আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আদালতকে অবশ্যই এ ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহকে বিবেচনায় আনতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আদালত তা বিবেচনায় না এনে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ শুধুমাত্র পুলিশ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।[২৮] বস্তুতঃ কোন শিশু বা কিশোর সত্যিই অপরাধ করেছে কিনা তা নিরূপণের প্রতি নজর দেওয়া হয় না। ফলে অপরাধী না হয়েও অনেক শিশু-কিশোরকে অন্যায়ভাবে সংশোধন কর্মসূচীতে রাখা হচ্ছে। কোন কিশোর বা শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হবার পর তাকে সংশোধন কর্মসূচীতে রাখা বাঞ্ছনীয়।[২৯]

---

[২৭] সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৩১-০৮-২০০৮।

[২৮] Sumaiya Khair, "Juvenile Justice Administration and Correctional Services in Bangladesh: A Critical Review", *Journal of the Faculty of law*, The Dhaka University Studies Part-F, Vol. 16 no. (2005), p. 12.

[২৯] মোহাম্মদ সাদেক, অপরাধ ও সংশোধন, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯), পৃ. ২২৭-২২৯।

৯। শিশু-কিশোর হেফাজত বিষয়ে অপ্রতুল বিধান

শিশু আইনের ২০ ধারায় হাজতবাস (রিম্যান্ড হোম) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সরকার কোন আদালত বা পুলিশ কর্তৃক হাজতে প্রেরিত শিশুদের আটক রাখা, রোগ নির্ণয় এবং শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্যে হাজতাবাস প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কিন্তু রিমান্ড হোম কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের অংশ নয়। অথচ বাস্তবে এটি ইনষ্টিটিউটের সাথে রাখা হয়েছে।

এছাড়া শিশু আইনের ৪৯ (১) ধারায় হেফাজত বিষয়ে অপর্যাপ্ত বিধান রাখা হয়েছে। জামিনে খালাসপ্রাপ্ত হয়নি এরূপ শিশুর হেফাজত বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, যে ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোন শিশু গ্রেপ্তার হওয়ার পর ৪৮ ধারার অধীনে খালাসপ্রাপ্ত না হয়, সেক্ষেত্রে যতদিন তাকে আদালতে হাজির করা না যায় ততদিন পর্যন্ত তাকে হাজত আবাস অথবা কোন নিরাপদ স্থানে আটক রাখার জন্য উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[৩০] অথচ ৫৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, আদালতের কোন বিশেষ আদেশ না থাকলে আটক রাখার মেয়াদ ২৪ ঘন্টার বেশী হবে না, আটক স্থান হতে আদালত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় উক্ত মেয়াদ বহির্ভূত থাকবে। অন্যভাবে বলা যায়, যতদিন তাকে আদালতে হাজির করা না যায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শিশুর প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়। ৪৮ ধারা অনুযায়ী শিশুর জামিনের ক্ষেত্রে সমাজের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। তাই শিশু বিধিমালায় এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। কারণ শিশু আইনে আটক বিষয়ে দু'ধরণের ব্যবস্থার উল্লেখ থাকায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

১০। অপরাধী শিশু-কিশোরের শাস্তির অসংগতিপূর্ণ বিধান

যদি আদালত কোন শিশু-কিশোরকে কারারুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে ঐ শিশু-কিশোরকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে আটক রাখতে হবে, সাধারণ কারাগারে নয়। আইনটিতে শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদী বা আসামীর সাথে একসাথে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু আইনে ৭০ ধারায় কোন শিশু অপরাধের জন্য শাস্তি পেলেও তাকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত না করে অপরাধ মুক্ত বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হিসেবে তাকে দেখতে হবে, এমনটিই বিধান রাখা হয়েছে। আইনটিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কোন শিশু যদি কোন ধরণের অপরাধ করে থাকে তবে তাকে সেই অপরাধের জন্য কখনোই চাকরির সুযোগ বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না বা ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৭৫ ধারার বিধান অনুসারে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া যাবে না বা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের

---

৩০ Nihad Kabir, *Juvenile Justice Administration in Bangladesh: Laws and their Implementation*, in *An Anatomy of BILIA Judicial Training with Difference*, Edited by Rahman, Wali-ur and Shahabuddin, Mohammad, (Dhaka: Bangladesh Institute of Law and International Affairs, 2005), p. 218.

৫৬৫ ধারার বিধান মোতাবেক ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত অবহিতকরণের বিষয়টি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।[৩১]

এসব বিশেষ বিধানগুলো স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, যদি কোন শিশু-কিশোর সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য 'শাস্তি' পেয়েও থাকে, তবে এ শাস্তি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা। এটি প্রচলিত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় প্রদত্ত শাস্তির অনুরূপ নয় বরং এটি ভিন্ন আঙ্গিকের একটি পদক্ষেপ। এছাড়া কোন শিশু দোষী হিসেবে পূর্বে প্রমাণিত হলেও ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৭৫ ধারা অনুসারে পুনরায় কৃত অপরাধের জন্য বর্ধিত শাস্তি দেওয়া যাবে না। একটি শিশুকে অপরাধ জগত থেকে উদ্ধার করার অর্থ একজন অপরাধীর সংখ্যা কমানো এবং একজন সুনাগরিকের সংখ্যা বাড়ানো। এটি হতে পারে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৩২] অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয় না।

১১। অপরাধী শিশু-কিশোদের আটক পরবর্তী কার্যক্রমের সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব

শিশু আইনের ৫২ ধারায় শিশুকে প্রত্যায়িত ইস্টিটিউটে সোপর্দ বিষয়ে আছে যে, কোন শিশু মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত তার ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনা করলে অন্যূনতম দু'বছর এবং অনধিক দশ বছর মেয়াদে আটক রাখার জন্য কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দ করতে আদেশ দিতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই আটকের মেয়াদ শিশুর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর আর বৃদ্ধি করা যাবে না। কিন্তু সমস্যা হল কোন্ প্রক্রিয়ায় শিশুর আটককাল নির্ধারিত হবে এবং ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ কার্যক্রম কোন্ ধরণের হবে, সে ব্যাপারে শিশু আইনে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই।[৩৩]

১২। শিশু-কিশোর অপরাধীদের মুক্তি বিষয়ে প্রক্রিয়াগত জটিলতা

শিশু আইনের ৬৭ (১) ধারায় বর্ণনা আছে, সরকার যে কোন সময়ে কোন শিশু বা কিশোর অপরাধীকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে বা অনুমোদিত আবাস থেকে সম্পূর্ণভাবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তিদানের আদেশ দিতে পারে। অথচ শিশু আইনে অপরাধী শিশুকে দু'ভাবে মুক্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। একটি হচ্ছে ৫৩ ধারা অনুযায়ী কিশোর আদালত থেকে এবং অপরটি হচ্ছে ৬৭ ধারা অনুযায়ী প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট থেকে। তবে এ ধারায় মুক্তিদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বিধানের উল্লেখ নাই। তাই শুধুমাত্র প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে এ আইনের সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। এভবে ৬৭ ধারাতে শিশু অপরাধীকে সংশোধনী কেন্দ্র থেকে মুক্তির বিষয়ে যথেষ্ট জটিলতা দেখা যায়। কিভাবে কোন্ বয়সে শিশুকে

---

৩১ তদেব, পৃ. ২৪।

৩২ শেফিনা বেগম, *শিশু আইন ও বিচার পদ্ধতি*, পৃ. ৬৫।

৩৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট, ২০০৫, পৃ. ৮।

মুক্তি দেওয়া হবে তা এ আইনে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। শিশু আইনে অপরাধী সাব্যস্ত শিশুর মুক্তির বিষয়ে এ সব পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।[৩৪]

১৩। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সীমিত এখতিয়ার

বর্তমানে দেশে গাজীপুর ও যশোর জেলায় অবস্থিত তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে তিনটি কিশোর আদালত আছে। এসকল আদালতের উপর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অর্পিত ক্ষমতার এখতিয়ার, কর্তৃত্ব এবং বিবেচনা উদ্বেগজনকভাবে সীমিত।[৩৫] আবার অনেক ক্ষেত্রে আইনী জটিলতার কারণে শিশু-কিশোদের সংশোধন কেন্দ্রে বা হোমে পাঠানো সম্ভব হয় না। অনেককে সংশোধন কেন্দ্রে নেওয়ার আগে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে কারাগারে রাখা হয়। ২০০৭ সালের এক রিপোর্টে ৫৭টি কারাগারের তথ্য অনুযায়ী আগস্টে কারাবন্দী শিশুর সংখ্যা ছিল ৩৪৮ এবং সেপ্টেম্বরে তা হয় ৩৫৪ এবং অক্টোবরে হয় ৩২৯।[৩৬] অথচ শিশু আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী কারাগারে একটি শিশুরও থাকার কথা নয়। অন্যদিকে কারাগার থেকে শিশু-কিশোরদের দেশের তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর বিষয়টিও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ আইনে জড়িত শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা আছে। দেশে তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও আইন অমান্য করে শিশুদের কারাগারে আটক রাখা হচ্ছে। এদের সাথে সাধারণ অপরাধীদের মতো আচরণ করা হচ্ছে। এমনকি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহেও পুলিশ বাদী এবং অভিভাবকবাদী শিশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। অন্যদিকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে কর্তৃপক্ষের অবহেলা, উদাসীনতা ও নিজস্ব পরিবহণের অভাবে দিনের পর দিন নির্ধারিত সময়ে আদালতে হাজির হতে পারে না হাজতী শিশু-কিশোররা।

১৯৭৪ সালের আইন পাশ হওয়ার পর থেকে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের বিষয়ে নানা কার্যক্রম সরকার বিভিন্ন সময় হাতে নিয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালের পূর্বে শিশু আইনের কোন রিপোর্টেড মামলা দেখা যায়না। সর্বপ্রথম মামলা হচ্ছে ১৯৯৩ সালের রাষ্ট্র বনাম ডেপুটি কমিশনার, সাতক্ষীরা ৪৫ (১৯৯৩) DLR (HCD) ৬৪৩=১৪ ১৯৯৪ BLD (HCD) ২৬৬।[৩৭] এ মামলাটিই প্রথম যার মাধ্যমে শিশু আইনের বাধ্যতামূলক বিধানগুলো সংক্রান্ত হাইকোর্ট বিভাগ ৭ দফা নির্দেশনা দেয়। এ মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ কারা মহাপরিদর্শককে কারাগারে আটক শিশুদের তালিকা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। এতে দেখা যায় যে, সে সময় সারাদেশের কারাগারগুলোতে ১০০০ এর বেশী শিশু-কিশোর আটক ছিল। পরবর্তীতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলা হাইকোর্ট বিভাগ শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী কার্যক্রমের নির্দেশ দেন। কিন্তু বাস্তবে হাইকোর্ট বিভাগের নিদের্শনা উপেক্ষা করে পৃথক কোন শেল্টার হোমে শিশু-কিশোরদের প্রাপ্তবয়স্ক

---

৩৪ তদেব, পৃ. ৮।

৩৫ A Participatory Assessment of the Situation of Children in Kishore Unnayan Kendra: Bangladesh; Save the Children UK & Department of Social Services, 2005

৩৬ সেভ দ্য চিলড্রেন, ২০০৭।

৩৭ 45 DLR, 1993 (HCD), 643=14 BLD, 1994 (HCD) 266.

কয়েদীদের সাথে আটক রাখা হচ্ছে। ২০০৬ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দেশে আটক ৭৩৮ শিশু-কিশোর কয়েদীর মধ্যে তিনটি কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে ছিল ১৬০ জন। কারাগারের মোট ৫৭৬ জন শিশু-কিশোর আটক ছিল। অস্ত্র, চুরি, হত্যা, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ছেলে ছিল ৫০৭ জন ও মেয়ে ৬৭ জন।[৩৮] বর্তমান প্রেক্ষাপটে এভাবে অসংখ্য শিশু-কিশোর ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। এদের সুরক্ষা, তত্ত্বাবধান ও সংশোধনের জন্য প্রতিটি জেলায় পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে একটি করে কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করা বা সাধারন আদালতে শিশু বান্ধব পরিবেশে শিশুদের বিচার সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

আজকের শিশু আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অপরাধ একটি সামাজিক ব্যাধি হলেও শিশু-কিশোরদের অপরাধের বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরাধের কারণ ও ধরন এবং তাদের অধিকার, মানবিক মর্যাদা, সংশোধণের সুযোগ ও অন্যান্য কল্যাণকর দিকসমূহ বিবেচনা করা হয়। শিশু আইনটির মুখবন্ধে বলা আছে, '১৯৭৪ সালের শিশু আইন শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের পরিচর্যা এবং অভিযুক্ত কিশোরদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন পুনর্বিন্যস্ত ও সংশোধন করিবার সাপেক্ষে একটি আইন।' তাই শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান হচ্ছে শিশু-কিশোরকে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে ভিন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা। শিশু আইনের যথাযথ প্রয়োগ না করে যদি শিশু-কিশোরদের দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের সাথে আটক রাখা হয়, তবে শিশুরা বড় ধরণের অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। ফলে দেশে অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং কারাগারে প্রেরিত শিশু-কিশোরদের মধ্যে সমাজের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হবে। পরবর্তীতে তারা কারামুক্ত হয়ে সমাজের চোখে ঘৃনার পাত্র হয়ে পড়বে। তাই অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে আমাদের সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রণীত এ আইনটিতে সুষ্ঠু বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জাতীয় শিশু-কিশোর নীতিমালা প্রণয়ণের পাশাপাশি আইনের বিশেষ ধারাসমূহ সংশোধন করা হলে শিশু অপরাধ দমনসহ সংশোধন, উন্নয়ন এবং অন্যান্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আরো সহজ হবে। শিশু-কিশোরদেরকে আইনে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। প্রতিটি থানায় একজন করে শিশু বান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা সুনির্দিষ্টভাবে রাখা প্রয়োজন। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে মুক্তি লাভের পর শিশু-কিশোরদের সমাজে পুনর্বাসন ও পুন:একত্রীকরণ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। শিশুর নির্দোষ মনোভাবের অপরাধ প্রবণ হয়ে যাওয়া থেকে প্রতিরোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা সমাজের দায়িত্ব। কারণ আগামীতে যে শিশু পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবে, যার মেধা, জ্ঞান, কীর্তিতে সভ্যতার পথ আরও দীর্ঘ হবে তার বিকশিত হওয়ার জন্য চাই নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা।

---

৩৮ *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬।